তারিখ ০7 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম

দৈনিক আমাদের সময়

ঝরে পড়া শিক্ষার্থী

চাই সম্মিলিত ও সমন্বিত উদ্যোগ

ড. শরীফ এনামুল কবির

সন্তানদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে। তাদের পড়াশোনার সার্বিক খোঁজ নিতে হবে। প্রতিবেশীদের শিশুদের খোঁজ নিতে হবে। সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। বিত্তশালী হলে সাহায্য করতে হবে অসামর্থ্যবানদের। কেবল সরকারকে দোষারোপ নয়, সম্মিলিত ও সমন্বিত উদ্যোগেই সব শিশুর শতভাগ শিক্ষাগ্রহণের পরিবেশ তৈরি হবে

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসিডিজি) গুরুত্বপূর্ণ সূচক সর্বস্তরে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে সরকারের কার্যক্রমও প্রশংসার দাবি রাখে। যদিও সামগ্রিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসব উদ্যোগকে অনেকেই অপ্রতুল বলে থাকেন। তবুও তো কিছু পদক্ষেপ শিক্ষার প্রসার ও গুণগত মানের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে, অস্বীকার করার জো নেই। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ধরে রাখতে উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেওয়া হচ্ছে। এর বাইরে দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্লাস চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া মেয়েদের বাল্যবিয়েতে নিরুৎসাহিত করতে খোদ প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর নেতৃত্বে কাজ চলছে। দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি ও গণিতের অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের প্রভাবে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আগের চেয়ে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া অনেক কমেছে। তবে প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ঝরে পড়ার হার এখন স্বাভাবিক পর্যায়ে রয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

প্রাথমিক পর্যায়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। আশার দিক, সারা দেশের সব শিশু অন্তত প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ নিতে পারছে। এ আশার দিকের সঙ্গে নেতিবাচক বাস্তবতাও রয়েছে। সম্প্রতি কয়েকটি গণমাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ঝরে যাওয়া সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এটি নিরাশার সঙ্গে উদ্বেগজনক। ২০১৩ সালের প্রাথমিক সমাপনীতে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা এবার জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় বসতে যাচ্ছে। এই তিন বছরের ব্যবধানে পরীক্ষার্থী কমেছে সাড়ে ৫ লাখ। অর্থাৎ প্রাথমিক সমাপনীর পর থেকে জেএসসিতে আসা পর্যন্ত তারা ঝরে পড়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত পিইসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাই ১ নভেম্বর থেকে অনুষ্ঠিতব্য জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। তিন বছর আগে অনুষ্ঠিত পিইসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২৯ লাখ ৫০ হাজার ১৯৩ জন শিক্ষার্থী। এ বছর জেএসসি ও জেডিসিতে মোট পরীক্ষার্থী ২৪ লাখ ১০ হাজার ১৫ জন। এর মধ্যে ছাত্র ১১ লাখ ২৩ হাজার ১৬২ জন ও ছাত্রী ১২ লাখ ৮৬ হাজার ৮৫৩ জন। ছাত্র থেকে ছাত্রী বেশি এক লাখ ৬৩ হাজার ৬৯১ জন। ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে জেএসসিতে ২০ লাখ ৩৫ হাজার ৫৪৩ ও মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে জেডিসিতে ৩ লাখ ৭৪ হাজার ৪৭২ জন পরীক্ষার্থী নিবন্ধন করেছে। ২৮ হাজার ৮৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীরা ২ হাজার ৭৩৪টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ তথ্য অনুযায়ী, তিন বছরে ঝরে পড়েছে পাঁচ লাখ ৪০ হাজার ৭৮ জন শিক্ষার্থী। শতকরা হিসাবে ঝরে পড়ার হার ১৮ দশমিক ৩০ শতাংশ।

এখন তাহলে স্বাভাবিক প্রশ্নই জাগে, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, গুণগত মান নিশ্চিত ও শিক্ষার মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপের সাফল্য কী। সরকার এ ক্ষেত্রে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বরাদ্দ বাড়িয়েছে। এতকিছুর পরও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বাড়লেও ঝরে পড়ার হার কমানো যাচ্ছে না; বরং দীর্ঘতর হচ্ছে ঝরে পড়াদের লাইন। এর জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কারিকুলামের সমন্বয়হীনতার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। আমার মনে হয়, আমাদের শিক্ষার মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপের কোথাও কোনো গলদ থেকে যাচ্ছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলো পূর্ণতা পাচ্ছে না। হয়তো সম্ভাব্যতা যাচাই, মাঠের প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ না করেই একের পর এক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। অযাচিত ব্যয় করা হচ্ছে প্রতিবছর। সময়, পরিবেশ, প্রতিবেশের সঙ্গে হয়তো গৃহীত পদক্ষেপ অসামঞ্জস্যহীন। অস্বীকার করার উপায় নেই, সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, উন্নয়নের এ ধারা সবকিছুর সফলতা নির্ভর করছে প্রকৃত শিক্ষা নিশ্চিতের ওপর। যদি শতভাগ শিক্ষাই নিশ্চিত না করা যায়, তবে বাকি সব পদক্ষেপ যে ঠুনকো হবে, বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা যে সমাজে বাস করি, সেখানকার অস্থিরতার বিষয়টি উপেক্ষা করা যায় না। প্রতিদিন গণমাধ্যমে অস্থিরতার নানা সংবাদে আমাদের দুশ্চিন্তা জাগ্রত হয়। পিতামাতা কর্তৃক নিজ সন্তানকে হত্যা, স্কুলে যাতায়াতরত শিক্ষার্থীদের ইভটিজিং, হামলা, ছুরিকাহত করে হত্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নৈতিক স্খলন, সুষ্ঠু পরিবেশের অভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। আমাদের পিতামাতারা এত বেশি ব্যস্ত, অনেক ক্ষেত্রেই তারা নিজ সন্তানদের খোঁজখবর রাখতে পারছেন না। সন্তানের সহপাঠী, খেলার সাথী, আড্ডার বন্ধু এমনকি হাউস টিউটরের সাহচর্যের খোঁজও নিতে ভুলে যাচ্ছি আমরা। মুক্ত পরিবেশ, আকাশ সংস্কৃতি, বন্ধুর প্রভাব, সামাজিক আচরণ প্রভৃতি কারণেই সন্তানদের আচরণে নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে দ্রুত। এমনকি আশঙ্কার কারণ হলো, হয়তো অনেক সন্তানই পড়াশোনা ঠিক রাখতে পারছে, কিন্তু নিজের চরিত্র, নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবনতি ঘটাচ্ছে, যা তার আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে। সন্তানের প্রতি আদর-স্নেহের আধিক্যও পরিস্থিতি জটিল করে তোলে। অবাধ স্বাধীনতা সন্তানের জন্য কল্যাণ বা অকল্যাণকর, হয়তো তা ভাবার সময়ও কম। ল্যাপটপ, আই-পড, ট্যাব, নোটবুক, মোবাইল ফোন, স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড, কম্পিউটারও যে শিশুদের ক্ষতির কারণ হতে পারে, তা ভাবনায় থাকে না। ফলে মাদক, জঙ্গিবাদ, অসৎসঙ্গসহ নানা ভয়াবহ নেতিবাচক উপকরণের সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি। এসব নানা সূচক সমাজে অস্থিরতা তৈরি করছে।

রয়েছে অর্থনৈতিক ভারসাম্যও। আমাদের গ্রামীণ সমাজের অনেক পরিবারই এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। রয়েছে অতিদারিদ্র্যের সংখ্যাও। অনেক অভিভাবক সন্তানের লেখাপড়ার পেছনে অর্থ ব্যয় করতে পারেন না। অথবা তাদের ইচ্ছেরও ঘাটতি রয়েছে। প্রাথমিক স্তরে হয়তো শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে বই পাচ্ছে। কিন্তু পড়াশোনার অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচের জোগান দেওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও হয়তো বিদ্যালয়ে খাবারও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আবার প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়ানো বাধ্যতামূলকও করা হচ্ছে। স্কুলগুলোতে টিউশন ও কোচিং প্রথা মারাত্মকভাবে বেড়েছে। কিন্তু দরিদ্র মানুষের পক্ষে টাকা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গ্যাপ কোচিংয়ে পূরণ সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষা উপকরণ থেকে শুরু করে প্রাইভেট কোচিং, গাইড বই সবকিছু মিলিয়ে শিক্ষা এখন বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। অনেকের পক্ষেই এই ব্যয় বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। লেখাপড়ার সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক নেই। লেখাপড়া দিয়ে বেকারত্ব দূর হবে এমনটিও নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ফলে অনেক শিক্ষার্থী লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে। আমাদের দেশে অনেক শিশু শ্রমিক আছে। গ্রামগঞ্জে পরিবারের সদস্যরা নিজেদের প্রয়োজনেই সন্তানদের লেখাপড়া বাদ দিয়ে কাজে লাগায়। যাদের পরিবার কৃষিকাজ করছে তারা ওই ধরনের কাজে চলে যায়, যার জন্য ঝরে যায়। আরেকটি বিষয় উল্লেখ করার মতো, মাধ্যমিকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ মেয়ে। যারা বাল্যবিয়ে এবং সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে শিক্ষা চালিয়ে নিতে পারছে না। অভাবের সংসার চালানো, আবার মেয়ের পেছনে বাড়তি খরচ। সে ক্ষেত্রে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিলে সব ঝামেলা চুকে গেল। আর ছেলেরা যোগ দিচ্ছে কাজে। কারণ পড়ালেখার চেয়ে কাজের মাধ্যমে আয় করাই পরিবারের কাছে লাভজনক বলে মনে হচ্ছে। বিশেষ করে চরাঞ্চল, হাওর ও পাহাড় এলাকার চিত্র খুবই উদ্বেগজনক। দুর্গম এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব বেশি হওয়ায় অনেকেই লেখাপড়া বাদ দিয়ে কাজে যোগ দিচ্ছে। আবার রয়েছে পড়াশোনার পদ্ধতিগত জটিলতাও। একটি ভালো উদ্যোগ সৃজনশীল পদ্ধতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা, এমনকি শিক্ষকরাও অনেক ক্ষেত্রে এটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি। শিক্ষার্থীরা পিইসিতে যেভাবে পাস করে, পরবর্তীকালে মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হয়ে নতুন কারিকুলামের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। প্রাথমিক ৫টি বই পড়ার একজন শিক্ষার্থীকে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উঠেই ১৩ থেকে ১৪টি বই পড়তে হচ্ছে। অনেকেই এই বইয়ের চাপ নিতে পারছে না। এ ছাড়া প্রাথমিকের জন্য প্রতি গ্রামে স্কুল আছে। কিন্তু মাধ্যমিকে তা নেই। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পঞ্চম শ্রেণি পাসের পর ছাত্রীরা আর দূরের স্কুলে পড়তে যায় না।

একটি শ্রেণি সরকারের সমালোচনায় মুখর থাকেন। পদে পদে সরকারের পদক্ষেপের ভুল ধরেন। কিন্তু অভিভাবক, শিক্ষক বা সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে যে আমারও কিছু দায়িত্ব থাকে, তা আমরা ভুলে যাই। শিক্ষার প্রসার, সবার শিক্ষা নিশ্চিতকরণে আমারও ভূমিকা রয়েছে। আমিও নিজের জায়গায় থেকে সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারি। সবার আগে আমাকে ঠিক হতে হবে। আমার সন্তানদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে। তাদের পড়াশোনার সার্বিক খোঁজ নিতে হবে। প্রতিবেশীদের শিশুদের খোঁজ নিতে হবে। সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। বিত্তশালী হলে সাহায্য করতে হবে অসামর্থ্যবানদের। কেবল সরকারকে দোষারোপ নয়, সম্মিলিত ও সমন্বিত উদ্যোগেই সব শিশুর শতভাগ শিক্ষাগ্রহণের পরিবেশ তৈরি হবে। অন্যথায় জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আগামী বিশ্বের সঙ্গে টিকে থাকার সংগ্রামে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে।

লেখক : সদস্য, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন; সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
skabir_ju@yahoo.com